ভয়

আহমেদ খান হীরক

সকালটা হব হব করছে। কিন্তু এর মধ্যেই পুরো বিছানা ভিজে গেছে ঘামে। এমনকি বালিশটাও।
ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়েও ঘরের ভেতর ঘামছি। ভাইয়ার রুমে এসি আছে, ওখানে যাব কি যাব না ভাবছি, এমন সময় জানালায় টোকা রবিন! রবিন!!
এ কণ্ঠ কার, জানা আছে আমার।
দাদু তার এলাকার গল্প শোনাতড়ৈশশবের গল্প। তার লুঙ্গি পরা-হাফপ্যান্ট জীবনের গল্প। এ কণ্ঠের সঙ্গে সে গল্পের শুধু মিল না, আছে আরও কিছু। আছে কিছু রহস্য আর অনেকখানি ভয়।
চুল থেকে টপ করে একফোঁটা ঘাম পড়ল গলায়। আবার টোকা রবিন! অ্যাই রবিন!!
সাদ্দাম হোসেনের কণ্ঠ, জানি। জানালা এখন খুলতে যাওয়া মানেইৃদাদুর ভাষায় খুলেছ কি মরেছ!
সে তো অনেক অনেককাল আগের কথা। দাদু তখন গ্রামে থাকত। বাস করত পাগলা নদীর পাড়ে। পাগলা নদী নাকি পেরিয়ে যাওয়া যেত একলাফেড়আর গেলেই চলে যাওয়া যেত ভিনদেশে। সেখানে এত এত ফুলের বাগান। লাল-কমলা-হলুদ ফুল। বাগানের মাথার ওপর ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি। কী যে সুন্দর সেসব দেখতে! কিন্তু ওসব দেখে মুগ্ধ হলেই হয়েছেৃআছে তোমার খবর!
কী খবর?
দাদু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলত, বিরাট খবর দাদু। তুমি যদি পাগলা নদীর ওপারের মাধুর্য দেখেৃ
মাধুর্য কী?
আচ্ছা শোনো ওই বাগানের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাও, আর আফসোস করে কোনো একবার বলেই ফেলো, আহারে, পারতাম যদি ওইখানে যেতে, তাহলেই হয়েছে
কী হয়েছে?
ওই কথা তখন ভোলারা শুনে ফেলে আর ফেললেই সব শেষ।
ভোলারা কী?
ভোলারা হলো প্লুরাল। ভোলা হলো সিঙ্গুলার। অশরীরী। মিশে থাকে বাতাসে। মিলে থাকে ছায়ায়। নিতে পারে যে কারও চেহারা। ঢুকে যেতে পারে মাছের শরীরে, হয়ে যেতে পারে ভ্যা ভ্যা ডাকছাড়া করুণ ছাগলও।
ছাগল হয়ে কী করে? তাকে তো মানুষ তখন কেটে খেয়েই ফেলবে।
দাদু হাসে ফোকলা দাঁতে। চশমা খুলে মুছে নেয় পাঞ্জাবি দিয়ে। বলে, তার চেয়েও যে ভয়ানক ব্যাপার দাদাজান, ভোলারা যে মানুষ হয়ে যেতে পারে!
আমার খুবই অবিশ্বাস হয়ড়মানুষ হওয়া অত সহজ নাকি? আম্মু-আব্বু প্রতিদিন আমাকে দশবার করে বলে, কবে যে তুই মানুষ হবিৃকবে যে তুই পাবি মানুষের মতো জ্ঞান!
জন্মে এই ১৬ বছর বয়স হওয়ার পরও যখন মানুষ হতে পারছি না, ভোলারা নিমেষে মানুষ হয়ে যাবে কীভাবে? এটা কি কোনো জোক?
দাদু বলে, তাহলে শোনো রবিৃআমার এ গল্প শতভাগ খাঁটি। মনে রেখো, এই দুনিয়ায় শরীরের সঙ্গেই থাকে অশরীর, কায়ার সঙ্গেই থাকে ছায়া আর আলোর মধ্যেই থাকে অন্ধকারৃএই ভুবনের সঙ্গেই থাকে আমাদের অজানা অন্য এক ভুবন। সেই ভুবনের বাসিন্দা এই ভোলারা! শুনবে আমার পুরো গল্পটা? তৈরি তো?
আমি শুধু মাথা নাড়াই। দাদুর চোখে যেন সাঁতার দিয়ে ওঠে সময়ের সমুদ্র। এ গল্প ভোলার, এ গল্প টোকার, এ গল্প পাগলা নদীর।
নদীর নাম পাগলা কে রেখেছে, কে জানে! এত সরু এক নদী, পাগলামি দূরের কথাড়নেই নিতান্ত দুরন্তপনাও। এই নদীর পাড়ে কাটে আমার সময়। তখন তোমাদের মতো এত বাহারি প্যান্ট-শার্ট-গেঞ্জি ছিল না কিন্তু আমাদেরড়ক্লাস সেভেনে পড়ি। হাইস্কুলের ওই খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট। বাকি সময়ে আমাদের সবার পরনে লুঙ্গি। গা খালি। লুঙ্গি কাছা মেরে আমরা কাদার ভেতর হাত দিয়ে কই মাছ ধরি। কইয়ের যে কী কাঁটা, আর এমন বিষৃ কোনো দিন সে কাঁটা যদি আঙুলে খাও, বুঝবে রাত পার হলেও ব্যথা দূর হয় না। এসব ব্যথাট্যথার অবশ্য ওষুধও আছে। আকন্দগাছের রস। গোল গোল বড় বড় পাতার এ গাছ। পাতার ডাল ছিঁড়লে ঘন দুধসাদা রস বের হয়। কী যে আঠালো! সে রস ঘায়ে লাগালে, যেকোনো ক্ষততে দিলেড়ঝা সেরে যায়, ক্ষত শুকিয়ে যায়! আকন্দগাছে ছেয়ে আছে পাগলা নদীর এপার। হাত-পা কাটলে, কই-শিংয়ের কাঁটা খেলেই গাছের কাছে ছুটি। অথচ পা দুটি ছুটে যেতে চায় ওপারে। কী আছে ওপারে, এ প্রশ্ন না করে বলা যায়, কী নেই ওপারে!
এই তো, এই এক লাফের সমান পাগলা নদী। সেটা পেরোতে আমাদের গলাও ভেজে না। অথচ পেরোনো যায় না। ওপারে যেতে এপারের নিষেধ। ওপার নাকি পিশাচপুরী।
এখন আবার বোলো না যে পিশাচ কী? তোমরা তো এখন জম্বি চেনোই। ওই যে মরে গিয়েও যারা মরে না, বেঁচে থেকেও যারা বেঁচে থাকে না। সিনেমায় খুব মারকাটারি করে। পিশাচও ধরতে পারো একই ধরনেরই কিছু। আমাদের সময় বাবা এই জম্বি ড্রাকুলার ছবিটবি, সিনেমা-টিনেমা ছিল না। আমাদের যা ছিল সব আসল। আসল দৈত্য, আসল দানো, আসল শাঁকচুন্নি, আসল পিশাচ। আর সবচেয়ে যা ভয়াবহ, তার নামই তোমরা শোনোনিড় সে হলো ভোলা। ভোলার নিজস্ব কোনো আকার নেই, আকৃতি নেই। কোনো কোনো রাতে অবশ্য তাদের দেখা যেত। তা-ও অনেক অনেক দূরে। এক সার হয়ে কিছু আগুন চলে যাচ্ছেড়গ্রামের বড়রা বলত, ওই যে দেখো, ভোলা যাচ্ছে!
বড়রা ভোলা দেখিয়েই যে শুধু ক্ষান্ত হতো, তা তো নয়ড়পইপই করে বলে দিতে পাগলা নদীর ওই পারে কখনোই যেন না যাই আমরা।
তবে মানুষকে যা নিষেধ করা হয়, তাতেই তো তার আগ্রহ। বয়স কম হলে সেটা থাকে আরও বেশি। পাগলা নদীর এপারে মাছ ধরতে ধরতে আমরা ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকতাম ওপারের দিকে। আমরা মানে আমি বিশেষত শহীদুল। আমার সঙ্গেই স্কুল যায় সে। অঙ্কে খুবই কাঁচা। ৭ থেকে ৮ বাদ দিতে বললে সে শুধু আকাশ নয়, যেন মহাকাশ থেকেই পড়ে!!
তার প্রশ্ন সহজ-সরল। ওপারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বলে, অ্যাহ, বললেই হলো? ওইটা কী করে পিশাচপুরী হয় রে জামাল? দিব্যি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমগাছৃপাতা দেখে বলে দিতে পারি ওই গাছগুলো ফজলি আমের। এই এত্ত বড় বড় হবে আমগুলো দেখিস
‘হলে আমারই-বা কী, আর তোরই-বা কী?’
‘কী মানে? আমগুলো পেড়ে এনে এখন ভর্তা খেতে কী ভালো লাগবে জানিস? তিন থাল ভাত সেঁটে দেওয়া যাবে।’
‘রহমত চাচা কী বলেছে মনে নেই? ওই আমবাগান আসলে আমবাগান নয়। ওইটা হলো মায়া।’
‘কিসের মায়া?’
‘আরে পিশাচরা তাদের পুরীতে যেন লোভে পড়ে মানুষ ঢুকে পড়ে, এ জন্য মায়ার বাগান করে রেখেছে, বুঝলি? বাগানও মায়ার, আমও মায়ার। না হলে এখন কি এমন সময় যে গাছগুলোর আম এমন বড় বড় হয়ে গেছে?’ শহীদুল চুপ করে যায়। তারপরই হঠাৎ যেন বিরাট এক ভেদ পেয়েছে এমনভাবে চিৎকার করে ওঠেড়জাত! ভালো জাত তাহলে আমগুলোর।

ডিউক জনের চার মূর্তি সিরিজের গল্প-দুঃসহ দুপুরে

তনি সুভংকর

‘বাপরে, গরম কী!’ লেখার প্যাড দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে বলল একহারা শরীরের পাতলা-সাতলা দীপ্র চৌধুরী, ‘তো, আজ দুপুরে কী করছি আমরা?’ ফরসা মুখভরা লাল লাল ফুটকি ওর। খাড়া মইয়ের মতো শরীরটায় প্রথমেই চোখে পড়ে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে থাকা কণ্ঠার হাড়। বাঁকানো নাকটা যেন বাজপাখির ঠোঁটের মতো তীক্ষ্ণ।
‘কিচ্ছু না!’ জবাব দিতে একমুহূর্তও দেরি হলো না আদনান রেজার, ‘এত্ত গরম পড়েছে যে মনে হচ্ছে গলে যাচ্ছি আইসক্রিমের মতো! সাঁতার কাটতে যেতেও ইচ্ছে করছে না এখন।’ ওর কপালের ওপর ঝুলে পড়া কয়েক গোছা কোঁকড়া চুল জন্ম থেকেই ধবধবে সাদা। শ্যামলা ছেলেটির চোখের মণি দুটো যেন দুফোঁটা গাঢ় বাদামি কফি। রাজ্যের মায়া খেলা করছে ডাগর চোখের তারায়। বুদ্ধির দীপ্ত ঝিলিকও রয়েছে তাতে।
‘বেশ তো, অলস দুপুরই কাটালাম নাহয় আজকের দিনটা।’ সায় জানাল সুঠামদেহী পাভেল রোজারিও, ‘এই গরমে বাইরে ঘোরাঘুরি কিংবা সাইকেল চালানোর কথা চিন্তা করলেই চক্কর দিয়ে উঠতে চায় মাথাটা!’
‘হুফ!’ কুটুস যেন দ্বিমত করল কথাটায়।
‘ও তো মনে হয় হাঁটতে যাওয়ারই প্রস্তাব দিচ্ছে, পাভেল।’ হেসে বন্ধুর পোষা কুকুরের সোনালি মাথাটা চাপড়ে দিল ছোটখাটো গড়নের মুকিত ইকবাল। পুরু ফ্রেমের কালো চশমাটা খুলে ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল, ‘এবার?’ স্বাস্থ্য ভালোর দিকে ওর, তবে মোটা বলা যাবে না মোটেই। গোলগাল মুখটার ওপর চুলগুলো খাটো করে ছাঁটা।
‘তবে আর কী!’ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পাভেল, ‘ঠান্ডা, ছায়া আছেড়এ রকম কোনো জায়গা খুঁজে বের করিগে, চলো। গল্পের বইটই খুলে বসি, অথবা ঘুম দিই লাঞ্চের সময় হওয়ার আগপর্যন্ত। আশা করি, মন্দ কাটবে না সময়টা।’ ‘হুফ! হুফ!’ আবার ডেকে উঠল গোল্ডেন স্প্যানিয়েল প্রজাতির কুকুরটা। এটাতেও রাজি নয় যেন।
‘হ্যাঁ, এটা অন্তত করতে পারি আমরা।’ উঠে দাঁড়াল দীপ্র।
‘যাওয়া যাক তাহলে।’ দেখাদেখি উঠে পড়েছে আদনানও, ‘গাছ খুঁজতে হবে বড় বড় পাতাওয়ালা। আর ধারেকাছে ঝরনাটরনা থাকলে তো কথাই নেই।’
বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীর কদমে হাঁটতে লাগল চার বন্ধু। ভ্যাপসা গরমের কারণে তাল মেলাতে পারছে না উৎসাহী, চঞ্চল চারপেয়েটার সঙ্গে।
ক্যালিফোর্নিয়ার নিষ্ঠুর সূর্যটা অবিরাম আগুন ঢালছে মাথার ওপর। নিচের মানুষগুলোকে একচুলও ছাড় দেবে নাড়এমন একগুঁয়ে জেদ যেন ওটার। এক টুকরো মেঘ নেই আকাশে। গাছগাছালির ছায়াও নেই আশপাশে। প্রচণ্ড গরমে অশরীরী প্রেতাত্মার মতো তাপতরঙ্গ নেচে চলেছে চোখের সামনে। একটুও বাতাস নেই কোথাও।
শহরের কোলাহল থেকে দূরে, আধা গ্রাম, আধা শহরের এক নিরিবিলি এলাকায় গড়ে উঠেছে এই বাঙালিপল্লি। বাড়িঘরগুলো দূরে দূরে ছড়ানো হলেও মানুষের মনগুলো কিন্তু কাছাকাছি। সবার সঙ্গে সবার আন্তরিক সম্পর্ক। আপদে-বিপদে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ানোটা যেন এখানকার অলিখিত নিয়ম। এ পাড়াতেই থাকে মুকিত, দীপ্র, আদনান আর পাভেল। হরিহর আত্মা যেন চার কিশোর।
‘ওর দিকে তাকালেই তো গরম লাগছে আমার!’ অনুযোগ করল মুকিত, ‘কীভাবে হাঁপাচ্ছে ও, দেখো! এক্কেবারে আদ্যিকালের স্টিম ইঞ্জিনের মতো! ওরে, জিবটা ভেতরে ঢোকা রে, কুটুস সোনা! পোকা ঢুকে যাবে তো মুখ দিয়ে!’
অলংকরণ: তনি সুভংকর
উৎফুল্ল কুটুস দৌড়ে যাচ্ছিল আগে আগে; মনে করেছিল যে পায়চারি করতেই বেরিয়েছে ওর মানববন্ধুরা। যখন দেখল, ক্ষীণ এক স্রোতস্বিনীর কাছাকাছি বিশাল এক গাছের ছায়ায় যাত্রাবিরতি নিল ওরা, যারপরনাই হতাশ হলো কুকুরটা। বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বন্ধুদের দিকে।
‘সরি, কুটুস, আজ আর হাঁটা নয়।’ প্রাণীটার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল পাভেল, ‘আয়, তুইও বোস আমাদের সাথে। গরমের মধ্যে আর খরগোশের পেছনে ছোটাছুটি করিস না।’
‘হ্যাঁ রে...সময়ই নষ্ট হবে শুধু।’ বন্ধুর কথায় সমর্থন জানাল আদনান, ‘বুদ্ধিমান খরগোশগুলো নিশ্চয়ই গর্তের মধ্যে ভাতঘুম দিচ্ছে এতক্ষণে, গরমটা কমলে পরে বেরোবে।’
‘খরগোশ কি ভাত খায় নাকি?’ ফিচেল হেসে কথাটা ধরল ভোজনরসিক মুকিত।
‘আরে, ওই আরকি...।’
‘হউফ!’ গাছপালা আর ঝোপের ছায়ায় চারজনকে জুত হয়ে বসতে দেখে অননুমোদনের সুরে ডেকে উঠল কুকুরটা। পাতা আর ডালের ঠাসবুনটের কারণে সূর্যের আলো একেবারেই পৌঁছাচ্ছে না গাছের নিচে। ফলে সবুজ ছায়ার আদরমাখা প্রশান্তি বিরাজ করছে নিচটায়।
‘হুম, এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা।’ মন্তব্য করল আদনান, ‘সবচেয়ে ঠান্ডাও বোধ হয় এই জায়গাই। পাথরে বাধা পেয়ে ঝিরিঝির পানি কী রকম আওয়াজ তুলছে, শুনছ না?’
‘হ্যাঁ, শুনেই তো ঘুম এসে যাচ্ছে!’ আসলেই ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে মুকিতের চোখ দুটো। চারপেয়ে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বুঝলি, কুটুস, আমরা কিন্তু বিশ্রাম নেব এখন। বেশি যদি লাফালাফি করিস, কান ধরে বাসায় রেখে আসব তোকে!’
শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কুকুরটা। লেজটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। বনজঙ্গলে এসে কিচ্ছুটি না করে এভাবে শুয়ে-বসে থাকার মানেটা কী, মাথায়ই ধরছে না ওটার। ঠিক করল, যে যা-ই বলুক ওরা, খরগোশই খুঁজতে বেরোবে সে!
ঘুরে দাঁড়াল জানোয়ারটা, অচিরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ওপাশে।
আধশোয়া বন্ধুরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ওটার চলে যাওয়া।
‘খরগোশই খুঁজতে গেল, তাই না?’ বলে উঠল দীপ্র।
‘থাকগে, যেতে দাও।’ হাত নাড়ল পাভেল, ‘দেখবে, ঠিকই ফিরে আসবে আবার জায়গা চিনে।’
‘উফ, এত বকবক কোরো না তো!’ আস্তে করে বন্ধুর পায়ে লাথি মারল মুকিত, ‘এখানকার বাতাসে মনে হয় ঘুমের ওষুধ আছে...কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না আমি!’
সত্যিই তা-ই। মিনিট কয়েক পরই দেখা গেল, চোখ খোলা নেই একজনেরও। পেপারব্যাক বইগুলো সঙ্গে আনাই সার, পড়া হয়নি একটা পৃষ্ঠাও। ছোট্ট একটা নীল রঙের পোকা মুকিতের অনাবৃত পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল, টেরই পেল না ও। একটা রবিন পাখি এসে বসল ওপরকার ডালে, জানতেও পারল না চার মূর্তি।
তপ্ত একটা দুপুর। কেউ নেই ওদের চারপাশে। জলের মৃদু কলতান আর পাখপাখালির ক্লান্ত ডাক ছাড়া চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। এমনভাবে ঘুমে বিভোর হয়ে আছে চার বন্ধু, যেন শুয়ে ওরা যে যার বিছানায়।
হঠাৎ দূরের রাস্তা দিয়ে জোরাল আওয়াজ তুলে চলে গেল একটা সাইডকারওয়ালা মোটরবাইক, কিছুই শুনতে পেল না ছেলেরা। জানলও না যে স্পিড কমিয়ে একপর্যায়ে বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে মোটরসাইকেলটা।
তৃণাবৃত রাস্তা ধরে ধীরগতিতে চলতে লাগল মোটরবাইক, এখন আর আওয়াজ হচ্ছে না তেমন। ঝোপটার কাছাকাছি এসে পৌঁছাল ওটা, যেটার আড়ালে সুখনিদ্রা দিচ্ছে চার বন্ধু।
আচমকা ইঞ্জিনটা একটু কাশির মতো শব্দ করে উঠতেই চমকে জেগে গেল আদনান।
কিসের আওয়াজ?
উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করল কিছু, তবে ততক্ষণে থেমে গেছে মোটরবাইক।
ফের চোখ লেগে এল আদনানের।
কিন্তু তক্ষুনি আবার নিচু কণ্ঠের আওয়াজ কানে আসতেই ঝট করে খুলে গেল চোখজোড়া।
মনে হলো, কাছেপিঠেই কথা বলছে একাধিক কণ্ঠ। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায়?
উঠে বসল আদনান। সন্তর্পণে ঝোপ ফাঁক করে উঁকি দিল। অনতিদূরে দেখতে পেল ও বাইক, সাইডকার আর গাড়ি দুটোর দুই আরোহীকে।
বাহন ছেড়ে নেমে এল যাত্রীরা। লোক দুটোকে মোটেই ভালো লাগল না আদনানের।
‘কী অদ্ভুত লোকগুলো!’ ভাবল ও। ‘গরমের এই দুপুরবেলায় ওরা কী করছে এখানে?’
নিচু স্বরে কথা বলছিল দুজনে, এরপর তর্কাতর্কি শুরু হলো ওদের। একজন বলল, ‘গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, কেউ অনুসরণ করছিল আমাদের! সে জন্যই জিনিসটা লুকানোর জন্য এখানে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।’
একটা ব্যাগ নামানো হলো সাইডকার থেকে। চরম বিরক্তিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে অপরজন। সঙ্গীর ইচ্ছার সঙ্গে একমত নয় যেন।
‘আমার মনে হয়, এই গাছটায় লুকালে ব্যাগটা খুঁজে পাবে না কেউ,’ আবার বলল প্রথমজন, ‘কী হলো, এমন হাঁড়ির মতো করে রেখেছ কেন মুখটা? বললাম না, ফলো করা হচ্ছিল আমাদের! এটা এখন সাথে রাখলে বমাল ধরা খাওয়ার ঝুঁকি আছে। খোদার কাছে শুকরিয়া করো যে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করাতেই কেবল পালাতে পেরেছি আমরা।’
সাবধানে বন্ধুদের ঘুম থেকে জাগাল আদনান। ফিসফিস করে বলল, অদ্ভুত কিছু ঘটছে এখানে।
পাতার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখল ওরা মোটরবাইকের পাশে পড়ে থাকা মেইলব্যাগটা।
‘হচ্ছেটা কী, বলো তো!’ ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল মুকিত। এত আরামের ঘুমটা নষ্ট হওয়ায় মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে ওর, ‘চিল্লাব নাকি ওদের উদ্দেশে?’
‘খবরদার, না!’ চট করে ঠোঁটের ওপর আঙুল চলে এসেছে আদনানের, ‘কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে বদমাশ লোক। সাথে পিস্তলটিস্তল থাকলে?’
‘ইশ্?, কুটুসটা যদি এখানে থাকত এখন!’ আফসোস করল দীপ্র, ‘খরগোশের পেছনে পেছনে ব্যাটা বোধ হয় এক মাইল দূরে চলে গেছে এরই মধ্যে!’
‘হ্যাঁ। সংখ্যায় ওরা মাত্র দুজন হলেও অনেক বেশি শক্ত-সমর্থ আমাদের চারজনের চেয়ে।’ পাভেলের মন্তব্য, ‘অতএব, লুকিয়ে-চুরিয়ে নজর রাখা ছাড়া আপাতত কিছুই করার নেই আমাদের।’
‘কোথায় লুকাচ্ছে ব্যাগটা, সেটা অন্তত দেখতে পাব আশা করি।’ স্বগতোক্তি করল আদনান, ‘কে জানে, কী আছে ওতে!’
‘নিশ্চয়ই চুরির মাল...।’ অনুমান করল পাভেল।
‘ওই যে দেখো, নিয়ে যাচ্ছে ব্যাগটা!’ উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছে মুকিতের মাঝে। ঘুমটুম সব উধাও।
‘হুম...গাছে উঠছে ব্যাটারা!’ একটু জোরেই কথাটা বলে ফেলল দীপ্র। যদিও তা কানে গেল না রহস্যময় লোক দুটোর।
প্রথমে একজন উঠে পড়ল গাছের মাথায়। অন্যজন কিছুটা উঠে ব্যাগটা তুলে দিল তার হাতে।
ভীষণভাবে কুটুসের অভাব অনুভব করছে ছেলেরা এ মুহূর্তে। এবার দেখা গেল, প্রথমজনের ডাকে দ্বিতীয় লোকটিও চেষ্টা করছে গাছ বাওয়ার। নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে, ধারণা করল চার বন্ধু। সম্ভবত কোথাও আটকেটাটকে গেছে ব্যাগটা। একটু পর দেখল ওরা, গাছের ওপরের ফাঁপা কোনো জায়গার মধ্যে ব্যাগ ঢোকানোর চেষ্টা করছে আগন্তুকেরা। শেষমেশ ‘ধুপ’ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে ভেতরে পড়ে গেল জিনিসটা। ‘দূরো!’ উসখুস করে উঠল পাভেল, ‘এভাবে চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় কোনো!’ বলে শেষ করতে পারল না, সহসা ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ এসে ঢুকল ওদের কানে।

চোখের চামড়া

নাবিল মুহতাসিম

ইন্সপেক্টর রইস আর তার সোর্স কামাল। রইস পুরোনো মেহগনির টেবিলটার ওপারে চেয়ারে বসা আর কামাল দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। দুজনেরই এটা চিরাচরিত ভঙ্গি, তোমরা কখনো কীর্তিমারী জেলা শহরে হাজির হলে ওদের এভাবেই পাবে।
রইস লম্বা-চওড়া বিশালবপু লোক, ঠোঁটের ওপরে জাঁদরেল গোঁফটা তাকে মানিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ভুরু কুঁচকে আঙুল মটকাচ্ছে সে। কামাল শুকনা-পাতলা একহারা গড়নের, কাপড়চোপড় পুরোনো, কিন্তু পরিষ্কার। মাথায় এলোমেলো চুলের বোঝা। কেবল ঝকঝকে ক্ষুরধার চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়, নিম্নবিত্ত এই লোক আর সবার মতো নয়। পুলিশের সোর্স বা সাহায্যকারী হিসেবে ‘টিকটিকি’ নামে পরিচিত কামাল এরই মধ্যে অনেকগুলো জটিল রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে। রইসের মেজাজ ভালো নেই, গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। এটা বুঝেই চুপ করে আছে কামাল। তবে রইস যখন তার দিকে তাকাল, সেই চাউনিতে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব আবিষ্কার করে কামাল সামান্য অবাক হলো বটে।
‘কামাল, দেখ, তোর অতীত নিয়ে আমি খুব একটা ঘাঁটতে চাই না, সেটা তুই জানিস,’ ভূমিকা শুরু করল রইস, ‘কিন্তু এবারে একটু নাড়াচাড়া দিতে হবে।’
বস কিসের কথা বলছে, কামালের তা ভালোই জানা আছে। প্রসঙ্গটা তার জন্য সুখের নয়, কিন্তু বিনা কারণে নিশ্চয়ই রইস এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে না। কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইল সে, কান খাড়া।
‘তুই তো একসময়...বর্ডারে স্মাগলিংয়ের খোঁজ রাখতি।’ রইস বলেই ফেলল, ‘এখনো নিশ্চয়ই তোর চেনাজানা অনেক লোক সেটা করে। তোকে ওই দিকটা নিয়ে একটু খবর বের করতে হবে আরকি।’
কথা সত্য। পুলিশের বেশির ভাগ সোর্সই কোনো না কোনোভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা আছে। কামাল একসময় সেটাই করত, যেটার বিষয়ে জানতে চাইছে রইস। অবশ্য বহু দিন হলো ওই জগৎ ছেড়ে এসেছে ও। কিন্তু তাই বলে যোগাযোগগুলো তো আর মরে যায়নি, আর সেটার কথাই বলছে ইন্সপেক্টর রইস।
‘চোরাচালান খুব বেড়ে গেছে।’ রইস যা বলল, সেটা কীর্তিমারীতে নতুন কোনো বাক্য নয়। সীমান্তবর্তী জেলা কীর্তিমারী, স্মাগলিং আছে এবং থাকবে। কামাল, যে কীর্তিমারীর সবার হাঁড়ির খবর রাখে, তাকেও এ কথা এমনি এমনি বলার কোনো মানে হয় না। পরের কথায় অবশ্য বিষয়টা খানিক খোলাসা করল রইস, ‘এমনিতে সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। কাস্টমস আর স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এবারে শুধু শাড়ি-ওষুধ-চিনি আসছে না। এবারে পণ্যের মান আরেক ধাপ উন্নত করেছে ওরা। বিপুল পরিমাণে মাদক পাঠাতে শুরু করেছে। আমরা যত দূর জানতে পেরেছি, কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ডার্ক ব্যাট আছে এর পেছনে। জানিস তো, তার পরিচয় এখনো অজানা।’
কথা সত্য। পুলিশের বেশির ভাগ সোর্সই কোনো না কোনোভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা আছে। কামাল একসময় সেটাই করত, যেটার বিষয়ে জানতে চাইছে রইস।
মাথা ওপর-নিচ করল কামাল। এটাও তার জানা। বেশ কিছুদিন হলো শহরের ভেতরেই ব্যস্ত সে রইসের সঙ্গে, বর্ডারের দিকে যাওয়া হচ্ছে না, কিন্তু বাজারে এই নতুন উৎপাত ওর চোখ এড়ায়নি। কামাল নিজে অন্ধকার জগতের খুব কাছাকাছি থাকে বলে জানে, বাজারে কোনো নেশার চালান বেড়ে গেলে কী কী পরিবর্তন দেখা যায়। সেসব লক্ষণ কিছুদিন হলো খুব চোখে পড়ছিল তার, কিন্তু সময়ের অভাবে মনোযোগ দিতে পারেনি বিষয়টাতে।
‘তোকে তো কিছু বলতে হবে না, তুই সব জানিস। তবু বলছি, সীমান্তের ওপার থেকে ড্রাগ পাঠানো আসলে কঠিন কিছু না। দুই দেশের মাঝখানে সীমান্ত বিরাট। সব জায়গায় পাহারা দেবার মতো যথেষ্ট সীমান্তরক্ষী নেই। অনেক জায়গায় শুধু কাঁটাতারের ওপর ভরসায় থাকতে হয়। সেটা যে কাজ করছে না, তা পরিষ্কার। কিন্তু ড্রাগস দেশের ভেতরে আনার পরে ওদের কাজ কঠিন হয়ে যায়। বর্ডার থেকে কীর্তিমারী শহরে আনতে হয়, অনেকটা রাস্তা। যানবাহন লাগে, কোনো লোককে সঙ্গে করে আনতে হয়। আবার সেই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পুলিশ-বিজিবির চেকপোস্ট। তবু কীভাবে যেন ড্রাগস চলে আসছে এই শহরে। জমা হচ্ছে কোথায়, তাও জানা যাচ্ছে না।’ মাথা ওপরনিচ করল কামাল। ‘স্যার, ওদের আসল ধান্ধা হইল কীর্তিমারী থাকিয়া অন্যান্য শহরে ড্রাগস পাচার করা। কীর্তিমারীৎ আর কতজনের কাছে বেচাইবে? রংপুর, বগুড়া, ঢাকা এখান থাকিয়া একই রাস্তার ওপর। কোনোমতে পাঠে দিবার পারলে টাকায় টাকা।’
‘তুই যা বললি সবই জানি এবং এগুলোই করে চলেছে ড্রাগস ব্যবসায়ীরা। তা যাই হোক, তোকে যে জন্য ডেকেছি, বলি। তুই একটু খোঁজ করবি, কে কে আছে পাচারের পেছনে।’
কামালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোনো পয়েন্টের সবচেয়ে দরকারি দিকেই চট করে চোখ চলে যায় তার। ‘স্যার, ড্রাগস যে কীর্তিমারীৎ ঢুকতেছে, ওইটা কীভাবে জানা যাইতেছে?’
‘দুইএক জায়গায় ধরা পড়েছে বর্ডার থেকে শহরে ঢোকার সময়। চালানের আকার দেখে মনে হয়েছে, প্রায়ই এ রকম চালান আসে আমাদের শহরে। সম্ভাব্য পরিমাণটা বিপুল।’ রইস বলল।
পরের প্রশ্নটা করার সময় কামালের চোখ যেভাবে ঝিকমিক করে উঠল, তাতে বোঝা গেল প্রথম প্রশ্নটা কেবল ভূমিকা ছিল। ‘কীর্তিমারী শহর থাকি বাইর হওয়ার সময় কোনো ড্রাগস আটকা পড়ছে?’ ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল রইসের। প্রশ্নটা করার কারণ বুঝতে পারছে না।
‘না তো। তেমন কোনো বড় চালান ধরা পড়েনি। আগে যেমন ছোটখাটো একুদুইটা ধরা পড়ত, তেমন আরকি।’ ‘স্যার, ড্রাগস কি তাইলে ঠিকই যাইতেছে ঢাকুরংপুরৎ, আমরা ধরবার পারতিছি না?’
‘হতে পারে। বর্ডার থেকে শহরে ঢোকার রাস্তায় যে রকম কড়াকড়ি, শহর থেকে বের হবার রাস্তায় ততটা নেই।’
‘আমার মনে হয়, আমরা ভুল জায়গাত দেখতেছি, স্যার,’ জ্বলজ্বলে চোখে বলল কামাল। ‘ড্রাগস শহরত ঢুকতেছে কিন্তু বাইর হইতেছে না। তার মানে ওরা কোথাও জমাইতেছে ওইটা। হয়তো একসাথে বড় চালানে পাচার করি দেবে দেশের ভেতরত।’
‘বর্ডারে ওদের ঠেকানো কঠিন হবে,’ মাথা দুলিয়ে বলল রইস। ‘কিন্তু ড্রাগের মজুতটা ধরতে পারলে পুরো চক্রটাকে অচল করা যাবে। কামাল, কাজে লেগে যা।’
সেটা অবশ্য কামালকে না বললেও চলত। রুম থেকে বিদায় নেওয়ার আগে অনেকটা আনমনে বলল ও, ‘সবার আগত বাইর করা লাগবে, ওরা নিজেগো মধ্যৎ যোগাযোগ করে কেমন করি।’
পরের আট-দশ দিন সারা কীর্তিমারীতে টইটই করে ঘুরে কাটাল কামাল।
শেষ দুই দিন ধরে শহরের নবাবগঞ্জ বাজারের দিকে বেশি ঘুরতে দেখা যাচ্ছে কামালকে। শহরের পুরোনো এই অংশটা ঘিঞ্জি দোকানপাটে ভর্তি। বেশির ভাগ পাইকারি দোকান আর লাগোয়া গুদাম। মুদিদোকান, স্টেশনারি, প্লাস্টিকের জিনিস, কসমেটিকস, কাপড়ড় সবকিছুর দোকান আর গুদাম আছে।
শহরের অসংখ্য মানুষকে চেনে কামাল, বহু জায়গায় তার যাতায়াত। অনেকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে পুলিশের সোর্স বা ‘টিকটিকি’ হিসেবে, আবার অনেকেই পছন্দ করে তার পরোপকারী, দিলখোলা স্বভাবের জন্য।
প্রথম দিন কামাল কেবল অলস ঘুরে বেড়িয়েছে নবাবগঞ্জ বাজারের গোলকধাঁধার মতো অলিগলিতে। গরমের দিন, ভ্যাপসা গরমে প্রাণ আইঢাই করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি ওর। যারা ওর কাজ সম্পর্কে জানে, তাদের সন্দেহমেশানো নজরও খুব একটা সুখকর নয়। কামাল তাই বোধ হয় অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েই আজ দুপুরের দিকে বসল ওর এক পরিচিত ছুটা কাপড়ের ব্যবসায়ীর পাইকারি দোকানে। ‘মায়ের দোয়া ক্লথ স্টোর’।
ডিউক জনের গল্পড়কে
দোকানের মালিক ইদরিস মিয়ার বয়স পঞ্চাশের মতো। শ্যামলা, বেঁটেখাটো চেহারা। গোঁফওয়ালা চেহারাটা সব সময় হাসিখুশি। বেশ খাতির করেই ওকে বসাল দোকানে। ‘কামাল ভাই, ঘামি গেছেন একেবারে। বসেন, বাতাস খান।’
কামাল দোকানের ভেতরে ঢুকে একটা টুলে বসতে বসতে বলল, ‘হ্যাঁ রে ভাই, একটা কাজতই আসছি। তবে কোনো লাভ হইতেছে না। চলি যাব।’
‘পরে যাইয়েন। আগে ঠান্ডা কিছু খিলাই। ওই হৃদয়, একটা কোক নিয়া আয়।’
হৃদয় নামের শুকনো লিকলিকে কিন্তু ধারালো চেহারার ছেলেটা এতক্ষণ ফোনে রিল দেখায় ব্যস্ত ছিল। এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফোন পকেটে ঢুকিয়ে মাথার ফেড চুলের কাটে হাত বুলিয়ে হাঁটা দিল মালিকের আদেশ তলব করতে।
এবারে কৌতূহলী চোখে কামালের দিকে তাকাল ইদরিস মিয়া। গোঁফের নিচে একটা চওড়া হাসি মুখে। নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ‘হে হে, কামাল ভাই, কোনো কাজে আসছেন নাকি?’
কামালও গলা নামিয়ে ফেলল। ‘হ্যাঁ ভাই। একটা লোককে খুঁজতেছি একটু।’
‘কন তো, কী রকম লোক?’ আগ্রহী মনে হলো ইদরিস মিয়াকে, ‘অনেক রাইত পর্যন্ত তো দোকানতই থাকি, অনেক মানুষক আসুযাওয়া করতে দেখি।’ ‘লোকটার চেহারা...বিশেষ কিছু বলার মতন না। ওই জন্যই ওকে খুঁজি পাওয়া কঠিন। লম্বায় ধরেন সাড়ে পাঁচ ফুট হইবে, শ্যামলা চেহারা, মুখ শেভ করা, মাথার চুল ছোট।’